ISSN 2072-3334
Development Compilation
Vol. 05. No. 01. February 2011

শ্যামা উপন্যাসে জাতীয় চৈতন্য ও রাষ্ট্রিক উৎকণ্ঠা

মাওলা প্রিন্স*

সারসংক্ষেপ : সাতচল্লিশোত্তর বাংলাদেশের উপন্যাসশিল্পের টেকসই পথ-নির্মিতির প্রাজ্ঞপুরুষ ও সফল সারথি ঔপন্যাসিক রশীদ করীম। শক্তিশালী এই ঔপন্যাসিকের রূপায়িত জীবনবোধ ও শিল্পচৈতন্যে ব্যক্তি যেমন খুঁজে পায় তার আত্মপরিচয়কে, তেমনি আত্ম-অস্তিত্বের স্বরূপোন্মোচনে সে পৌঁছে যায় একটি জাতির প্রথিত শিকড়মূলে। তাঁর *শ্যামা* উপন্যাটিও এমনি একটি উপন্যাস যেখানে ছেষট্টির প্রেক্ষাপটে নর-নারীর প্রেমের মোড়কে ঘনীভূত হয়েছে জাতীয় চৈতন্য, উন্মোচিত হয়েছে জাতীয় পরিচয় এবং ইঙ্গিতায়িত হয়েছে রাষ্ট্রিক উৎকণ্ঠা। কলেবরের বৈপরীত্যে চারিত্র্য আর বিশেণ্ডষণের বৈপরীত্যে থিম্‌কে প্রাধান্য দিয়ে *শ্যামা*র এই চিত্র-পরিকল্পনায় রশীদ করীম দেখাতে সক্ষম হন তাঁর লেখনির সুদৃঢ়তা।

জাতিগত পরিচয়ের প্রশ্নে এদেশীয় তথা এভূখণ্ডের মানুষের দ্বিধা বা সঙ্কট দীর্ঘ দিনের। বাঙালি নাকি বাংলাদেশী এমন বিতর্ক স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে সৃষ্টি হলেও বাঙালি নাকি পাকিস্তানী, ভারতীয় নাকি বাঙালি, বাঙালি নাকি মুসলিম, বাঙালি মুসলিম নাকি বাঙালি হিন্দু প্রভৃতি দীর্ঘ দিনের চর্চিত প্রসঙ্গগুলো প্রায়শই ব্যক্তিস্বার্থনির্ভর রাজনৈতিক কারণে উদ্ভূত ও জিয়ন্ত হলেও এর সঙ্গে যুক্ত ছিলো সাধারণ মানুষের আবেগ ও মমত্ব, বিশ্বাস-সংস্কার আর ঐতিহ্য। যা কষ্টিপাথরে পরখ করে নিতে কিংবা বিজ্ঞান ও বিচক্ষণতায় জারিত করতে এদেশীয় মানুষের সময় লেগেছিলো। এক্ষেত্রে বাহান্নর ভাষা আন্দোলন ছিলো এ অঞ্চলের আপামর মানুষের চৈতন্যোদয়ের ভিত্তিভূমি– চেতনাকে শাণিত করার এক দুর্বার শক্তি। আর এই শক্তি একটা আর্থ-রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক অনিবার্যতায় সাহসে রূপান্তরিত হতে থাকে একটু একটু করে এবং ষাটের দশকে দেখা যায় এর বৈপণ্ডবিক আত্মপ্রকাশ। এসময়ে এদেশীয় মানুষ আত্মানুসন্ধানে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয় নিজের জাতিগত পরিচয়কে এবং সঙ্কট ও সঙ্কীর্ণতার ঊর্দ্ধে ওঠে উৎকণ্ঠিত হয় এক অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রগঠনে। এমনি এক পরিপ্রেক্ষিত নান্দনিক মাত্রা পায় রশীদ করীমের (জ. ১৪আগস্ট ১৯২৫) *শ্যামা* উপন্যাসে। রশীদ করীমের সপ্তম উপন্যাস *শ্যামা* ১৯৮৩ সালে সাপ্তাহিক *বিচিত্রা*র বিজয় দিবস সংখ্যায় প্রকাশের পর পরের বছর তা *সোনার পাথর বাটি* নতুন নামকরণে গ্রন্থভুক্ত হয়; কিন্তু ১৯৮৫ সালে দ্বিতীয় মুদ্রণে ঔপন্যাসিক *শ্যামা* নামটিই পুনর্বহাল করেন। *শ্যামা* থিম্‌প্রধান উপন্যাস এবং ঔপন্যাসিকের এক অনুপম সৃষ্টি। বলা যায়, বাংলাদেশের উপন্যাসশিল্পে যে ক'টি উপন্যাস স্বল্প-কলেবর বিশিষ্ট হয়েও স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল, রশীদ করীমের *শ্যামা* নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য।

* প্রভাষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়।

রশীদ করীমের অধিকাংশ উপন্যাসের ন্যায় *শ্যামা*ও উত্তম পুরুষে লেখা। উপন্যাসটিতে 'আমি'র ভূমিকায় অবতীর্ণ মিন্টুর স্মৃতিচারণে গড়ে উঠেছে কাহিনীর অবয়ব : 'আমার বয়স তখন চলিণ্ডশের কাছাকাছি, বাস করি অখ্যাত গলির জীর্ণ বাড়ির এক কোণের এক ভগ্নাংশে। মাসিক ভাড়া আমার পকেটের পক্ষে সহনীয় ছিল বলেই সে বাড়িতে থাকার আর সমস্ত দুঃখ-কষ্টকেই তুচ্ছ করতে পেরেছিলাম। সেই সব যন্ত্রণার মধ্যে যেটি ছিল সর্বপ্রধান তা হচ্ছে দ্বিতলের সেই কন্যাটির সঙ্গীত সাধনা যার প্রধান লক্ষ্য ছিলাম আমিই।'[১] কিন্তু না, সেই কন্যাটি সমগ্র উপন্যাসে কোনো ভূমিকাই রাখতে পারে নি। আসল কথা হলো, এমন নিঃসঙ্গ ও স্বল্প আয়ের আটপৌরে সময়ে মিন্টুর ভাবনায় বড় হয়ে দাঁড়ায় যে সত্যটি, কিংবা তার হৃদয়ের সমস্ত অনুভূতিকে গ্রাস করে যে বিষয়টি তা হলো শ্যামার চিঠি : 'মিন্টু, ভালো আছো তো ? কতদিন তোমাকে দেখি নি ! বাইশ তারিখে লাহোরের ফাস্ট ফ্লাইটে ঢাকা আসছি। এয়ারপোর্টে উপস্থিত থাকবে। এ চিঠি কে লিখছে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছো। আর যদি না-ই পারো, তো বলেই রাখি, আমার নাম শ্যামা।'[২] মিন্টু হারিয়ে যায় তার বিগত জীবনে; যেখানে শ্যামাকে নিয়ে তার মাত্রাতিরিক্ত কোনো ভাবাবেগ নেই, নেই প্রচলিত অর্থে রোমান্টিকতার কোনো রঙ ছোঁড়াছুঁড়ি, কিংবা নির্জন মুহূর্তে দু'জনা বসে ছোঁয়াছুঁয়ির কোনো রোমাঞ্চকর সুখানুভূতি। মিন্টুর এ পিছনফেরায় নেই না বলা কিংবা না পাওয়ার কোনো অব্যক্ত কথা, হৃদয়ের তন্ত্রীতে জমে থাকা গোপন ব্যথা। শ্যামা ও শ্যামার সঙ্গে ছেলেবেলাকার নিতান্তই বন্ধুত্বের টুকরা টুকরো কিছু কথা কিংবা নিদর্শনেই তার এই নির্নিমিখ চাওয়া :

> শ্যামা ছিল সেই রকম এক মেয়ে যাকে ভালো বলা যায়, মন্দ বলা যায়, কিন্তু কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না। কারণ সে ছাত্রী হিসেবে ছিল সকলের ওপর এবং দেখতেও ছিল অসামান্য সুন্দরী। সেই সময়ই শ্যামা গুছিয়ে শাড়ি পরতো, কপালে টিপ লাগাতো এবং তার স্বাভাবিক সৌন্দর্য কোনো অস্বাভাবিক কারণে ম্লান হয়ে যায় সেদিকে তার সতর্ক দৃষ্টি ছিল।
>
> তার দোষগুলির মধ্যে যেটা অন্যান্য সমবয়সী মেয়ের এবং বহু ছেলের কাছে সবচাইতে অসহ্য ছিল তা এই যে, সে একটি বিশেষ ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে প্রায়ই ম্যাটিনি শোতে সিনেমা দেখতো এবং সিনেমা শেষ হলে রেস্টুরেন্টের পর্দা-ঢাকা কেবিনে বসে চপ-কাটলেট খেতো।
>
> সেই ছেলেটি ছিলাম আমি।
>
> কিন্তু আমি কোনোদিনই সিনেমা হলে তার হাত ধরি নি, কিংবা পর্দা-ঢাকা কেবিনে চুম্বনের চেষ্টা করি নি। আমার এইসব গুণাবলির জন্যই আমি ছিলাম বা হতে পেরেছিলাম শ্যামার নিত্যসঙ্গী।[৩]

পাঁচ বছর বয়স থেকে এক সঙ্গে বড় হওয়া মিন্টুকে পরম নির্ভরতায় নিত্যসঙ্গী হিসেবে পাশে রেখেই শ্যামা একসময় নবাগত হায়দারের প্রতি হয় আকৃষ্ট। মিন্টুকে মাঝখানে রেখে শ্যামা হায়দারের সঙ্গে মেলামেশা করে নিয়মিত। চাচাতো ভাই ইমরান তার বুক স্পর্শ করলে সে-কথাও শ্যামা আত্মার সঙ্গীরূপী মিন্টুকে বলে স্বস্তি খুঁজে : 'তোমাকে বলবো না তো আর কাকে বলবো ! আমার আর কে আছে ?... সে যখন বুকে হাত রাখলো আমার খুব রাগ হয়েছিল। কিন্তু একটা কথা বলবো ? একটু একটু যে ভালোও

লেগেছিল। কেন এমন হয় তুমি আমাকে বুঝিয়ে দাও।’[৪] ইমরানের সেই অশোভন আচরণের পরও শ্যামা তার কাছে সাঁতার শিখে, ইমরানের সঙ্গে সিনেমায় যায়; কিন্তু ‘হায়দার নয়, ইমরান নয়, শ্যামার বিয়ে হলো এক তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে। আমরা তখন ফোর্থ ইয়ারে। এই তৃতীয় ব্যক্তিটি শিক্ষিত, মার্জিত, বিনয়ী ও সুপুরুষ এবং এখানে যেটা সবচাইতে বড় কথা– সচ্চরিত্র। ভদ্রলোকের নাম মুরাদ।... তিনিও শ্যামার দূর সম্পর্কের ভাই। অক্সফোর্ডে ছিলেন বলে শ্যামার জীবনে এতোদিন তাঁর কোনো ভূমিকা ছিল না। তিনি ফেরে আসতেই দু’জনের দু’জনকে খুব ভালো লেগে গেল।’[৫] শ্যামা তখনও মিন্টুকে ভুলে যায় নি। শ্যামার স্বহস্তে লিখিত প্রথম নিমন্ত্রণ লিপিটি মিন্টু-ই লাভ করে; অনুরূপ শ্যামা বধূবেশে মিন্টুকে দেখা দেয় মুরাদেরও আগে : ‘মিন্টু, আমাকে কেমন দেখাচ্ছে ? বধূবেশে তুমিই কিন্তু প্রথম পুরুষ আমাকে দেখলে। এমনকি মুরাদেরও আগে।... প্রতিজ্ঞা করো, আমাকে ভুলে যাবে না ?’[৬] এরপর দেশ ভাগ হলে শ্যামা কলকাতা ছেড়ে ঢাকা, অতঃপর স্বামীর সঙ্গে করাচি চলে যায় এবং কিছুদিন পর একটা চাকুরি লাভ করে মিন্টু চলে আসে খুলনায়। এরপর শ্যামা অনেকবার ঢাকায় আসলেও মিন্টুর সঙ্গে দেখা হয় নি। অতঃপর ১৯৬৬ সালের মে মাসের শেষাশেষি নির্দিষ্ট দিনে শ্যামার পেণ্ডন তেজগাঁ বিমানবন্দরে ল্যান্ড করে। শ্যামার সঙ্গে পুনর্মিলনের প্রথম ক’দিন ধোঁয়াশায় কাটলেও ধীরে ধীরে মিন্টু আবারও সেই পুরোনো বন্ধুত্বের স্বাদ কিংবা সংস্পর্শ অনুভব করে। শ্যামা পুরোনো দিনের মতো এবারও তার জীবনের কথা শোনায়। এর অনেকখানি ওয়েস্ট পাকিস্তানে তার চলাফেরা কিংবা জীবনাচারের অভিজ্ঞতাপুষ্ট হলেও প্রসঙ্গক্রমে এসে যায় তার চাইতে অন্তত দশ-পনেরো বছরের ছোট এক ইয়ং পাঞ্জাবি সিএসপির কথা। অন্তরঙ্গতার সূত্র ধরে একদিন সন্ধ্যাবেলা ‘চোখে আর দাঁড়াবার ভঙ্গিতে একটা প্রত্যাশা’ দেখে যাকে শ্যামা তার বুকের ওপর চেপে ধরেছিলো। শ্যামা মিন্টুর নিকট একটা ধাঁধা রাখে : ‘*ওয়ার এ্যান্ড পিস*-এর নাতাশা তার জীবনে বহু ভুলপ্রেমের জঞ্জাল জমতে দিলো। সে যে শুরু থেকেই চিরকাল একমাত্র পিয়েরকেই ভালোবেসেছে–এই সত্য আবিষ্কার করতে এতো দেরি করলো কেন ?’[৭] বস্তুত এ শুধু নাতাশার সঙ্কট নয়, শ্যামার জীবনেও সমধিক সত্য।

শ্যামা রশীদ করীমের এক অনবদ্য নারীচরিত্র। পূর্ববর্তী *উত্তম পুরুষ*(১৯৬১)-এর সেলিনা কিংবা *প্রসন্ন পাষাণ*(১৯৬৩)-এর তিশনার মতো সুন্দরী শিক্ষিতা অভিজাত ও পরিশীলিত মনের মেয়ে এবং একই ভৌগোলিক এলাকার মানুষ হয়েও ব্যারিস্টারকন্যা শ্যামা তাদের থেকে স্বতন্ত্র। সেলিনার ‘চোখের ভ্রূকুটি, তাঁর ঠোঁটের কোণে প্রথমার চাঁদের মতো তির্যক হাসি’, কিংবা তিশনার ‘সহজাত বোধশক্তি’র বৈপরীত্যে এক আশ্চর্য ছেলেমানুষীসুলভ সারল্য ও আত্মসচেতনতায় ঔদাসীন্য নিয়ে তার প্রাত্যহিক পথচলা। তাইতো স্কুল জীবনে সাখাওয়াৎ মেমোরিয়ালের পরিবর্তে ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন এবং কলেজ জীবনে লেডি ব্রেবের্নের পরিবর্তে বেথুন (বা বিটন) কলেজে পড়েছিলো বলে শামীম আসল নাম খুইয়ে শ্যামা হয়ে গেলেও সে হয় সন্তুষ্ট; বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনে সেলিনা কিংবা তিশনা যেখানে চতুর বা সজাগ, শ্যামা সেখানে সহজাত ও স্বাভাবিক; ‘সেদিন রাত্রে খিরিদপুরে কি হয়েছিলো ?’ জানতে চাইলে সেলিনা শাকেরকে যেরূপে বলেছিলো, ‘ভুলে যেও না, আমি মুসলমানের মেয়ে, আমার অধঃপতনের একটা সীমা আছে’, কিংবা আত্মকাহিনীর শুরুতেই তিশনা নিজেকে ‘এক মুসলিম পরিবারের কন্যা’ হিসেবে যেভাবে উপস্থাপন করে, শ্যামা সেভাবে নিজেকে মনে করে না : ‘অনেকেই বলতো শ্যামার পোষাক-আশাক, চালচলন, চিন্তা-ভাবনার মধ্যে হিঁন্দুয়ানির যথেষ্ট প্রভাব আছে। এসব কথা শুনে শ্যামা অবশ্য আশ্চর্য হতো। সে মুসলমান বা হিন্দু কোনো ধর্ম অনুসারেই চিন্তা করতো না। স্বাভাবিকভাবেই যে চিন্তা তার মাথায় আসতো, তাকেই আসতে দিতো। আসলে সে ধর্ম সম্পর্কে জানতোই খুব কম।... অবশ্য সামাজিক জীবনে কোথায় যে মুসলমানির শেষ আর কোথায় যে হিঁন্দুয়ানির শুরু শ্যামা ঠিক বুঝতো না। বেশির ভাগ লোককে যা করতে দেখতো সেও তাই করতো।’[৮] কিংবা যৌবনের প্রথম প্রহরে প্রেমের রঙ্গলীলায় সেলিনা কিংবা তিশনা যেখানে নেয় রহস্যময়তার আশ্রয়, শ্যামা সেখানে প্রেমকে স্বীকার করে অবলীলায়। কিন্তু সেই প্রেম যে কতোটা মিথ্যা, ক্যান্সারাক্রান্ত শ্যামার সে ভুল ভাঙ্গে জীবনের পড়ন্ত বিকেলে; প্রমাণ মেলে শ্যামার কাতরোক্তিতে :

> ইমরান আমার বুক স্পর্শ করেছে। হায়দারের পেছনে আমি ছুটেছি। মুরাদের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে। বয়োকনিষ্ঠ এক পাঞ্জাবি ছোকরাকে বুকে চেপে ধরেছি। একটির পর একটি ভুলকে সত্যজ্ঞান করে গেছি। কিন্তু আসল সত্যটি সর্বক্ষণ আমার পাশেই ছিল। তাকে দেখেও দেখতে পাই নি। এতোসব ভালোবাসার মধ্যে আমি একটি ভালোবাসাকেই খুঁজে বেড়িয়েছি। কিন্তু সেই লোকটিকে আমার মন যখন তার সত্যিকার পরিচয়ে চিনলো, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। অতগুলো ভালোবাসা নয়। অত লোকের সঙ্গে ভালোবাসা নয়। সেই শৈশব থেকেই একটি লোককেই আমি মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছি। কিন্তু বুঝতে পারি নি, মিন্টু, তখন বুঝতে পারি নি।... বলতে হবে ? সে লোকটি তুমি ![৯]

শ্যামার এই ভুল ভাঙ্গা কিংবা আপন মনের খোঁজ পাওয়া হঠাৎ-ই ঘটে নি, অর্থাৎ এটি ঔপন্যাসিকের আরোপিত কোনো বিষয় নয়। এর পশ্চাতে রয়েছে অনেক দেখে অনেক ঠেকে শ্যামার অর্জিত জীবনাভিজ্ঞতা, ক্রম বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার মানসিক পরিপক্বতা ও উভয়ের মধ্যকার দীর্ঘদিনের ব্যবধান। কেননা কিশোর মিন্টু কিশোরী শ্যামার সর্বমুহূর্তের সহচর হলেও তা ছিলো ‘অনেকটা সহজাত অভ্যাসের মতন। তাতে নতুনত্বের চমক নেই। তাই অবলীলায় মিন্টুর চোখের সামনে দিয়েই হায়দার আসে, হায়দার যায় এবং ইমরানও ঘনিষ্ঠ হয়। শ্যামার জীবনে এ এক ভিন্ন স্বাদের পরিচয়–যার বিচার তার মতন মেয়ে ঠিক করে উঠতে পারে না। আর সে কারণেই অগ্রাহ্যও করতে পারে না।’[১০] কিন্তু শ্যামা চরিত্রটির ব্যাপ্তি কিংবা বিশেষত্ব ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি তার এই প্রেমাবিষ্কারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ঢাকার আজিজ মার্কেটের কাঁচা বাজারে শ্যামা যখন কাগজি লেবু নাকের সামনে ধরে শুঁকে, গলদা চিংড়ি দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে, মুড়িঘণ্ট রাঁধবার জন্য রুই মাছের মাথা কিনে, দেশী মাছ দেখে অকৃত্রিম অনুভূতি অনুভব করে; তখন তা অর্জন করে ভিন্নমাত্রা :

> জানো মিন্টু, আজ আমি ধন্য হলাম।... আমার গায়ে দেশের কাদামাটি লেগেছে বলে।... আমাদের দেশের শাকসবজির যে এতো রূপ তা কখনো আগে এভাবে চোখে পড়ে নি। আমার মনে হলো আমি স্বদেশের মুখ দেখছি। মনে করো না আমি জীবনানন্দীয় কাব্যি করছি। কাদামাটি ময়লা পানিও ভালো লাগলো। মনে হলো আমি প্রথম নিজেকে আবিষ্কার করলাম। সেই কাদা আর মাটি আমাকে ডাকছে–তা যেন আমারই হৃদয়ের প্রতীক।[১১]

বস্তুত ছেষট্টির সময়চিত্রে শ্যামা চরিত্রটি বিনির্মাণ প্রকল্পনায় রয়েছে রাষ্ট্রীয় প্রশ্নে বাঙালি জাতির অস্তিত্বচেতনের ইঙ্গিত। শ্যামার অন্তরে মিন্টু প্রথমাবধি প্রেমের আসন অলঙ্করণ করে থাকলেও সে যেমন তা বুঝতে পারে নি, তেমনি বাঙালির অন্তরে বাংলাদেশকে ঘিরে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের আজন্ম লালিত স্বপ্ন সুপ্ত থাকলেও বাঙালি সে স্বপ্নের খোঁজ পায় নি অনেক দিন। শ্যামাকে যেমন জীবনের অনেকখানি সময় ভুল প্রেমের জঞ্জাল বহন করতে হয়েছে, তেমনি আর্থ-রাজনৈতিক দিক থেকে এগিয়ে থেকেও শুধুমাত্র হৃদয়ের সঠিক সন্ধান না জানার জন্য বহিরাবেগে বশীভূত হয়ে বাঙালিদেরকেও বারংবার ভুল সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। যাবতীয় বিভেদ থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র ধর্ম এক হবার কারণে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব বঙ্গের রাষ্ট্রীয় একাত্মতা বাঙালির ভুল সিদ্ধান্তরই আরেকটি বড় ভুল। শ্যামার বিয়ে ও করাচী চলে যাওয়ার সঙ্গে এর অন্তর্নিহিত সাযুজ্য স্মর্তব্য। কিন্তু শ্যামার মতোই বাঙালিও ভুল সিদ্ধান্তে সুখী হতে পারে নি; তার অতৃপ্ত হৃদয় হয় নি তৃপ্ত। ফলত বেদনার্ত বাঙালি ক্রমেই পশ্চিম পাকিস্তান সম্বন্ধে হয়ে উঠেছে মোহমুক্ত, আত্মাবিষ্কারে অস্তিত্বরক্ষায় হয়ে উঠেছে সোচ্চার। সমালোচকের মতে, 'শ্যামার ভুল প্রেমের সম্বন্ধে মোহভঙ্গের সঙ্গে তা সমান্তরালভাবে সাজানো।'[১২] তবে, ভারত নয়, পাকিস্তান নয়, একমাত্র বাংলাদেশেই ভালোবাসার খোঁজ পাওয়া শ্যামার মৃত্যু 'বাংলাদেশকে ভালোবাসারও ক্যান্সার-মৃত্যু' নয়; বরং বাংলাদেশের প্রতি বাঙালির ভালোবাসাকে আরো সজীব, প্রাণবন্ত ও হৃদয়স্পর্শী করতেই ঔপন্যাসিকের এ শিল্পপ্রয়াস।

মিন্টু উপন্যাসের কথক ও নায়ক এবং রশীদ করীমের কেন্দ্রীয় পুরুষচরিত্রগুলোর মতোই সদাচারী, স্বল্পভাষী, সাদাসিদে ও সাধারণ ঘরের ছেলে। আই.এ. পরীক্ষায় অপ্রত্যাশিতভাবে থার্ড ডিভিশন পেলেও বি.এ.-তে ইতিহাসে ফাস্টক্লাস পেয়ে সে-ও *উত্তম পুরুষ*-এর শাকের কিংবা *প্রসন্ন পাষাণ*-এর কামিলের মতো নিজের প্রতিভার পরিচয় দেয়। অনুরূপ তার বিশ্বাসযোগ্যতার পরিচয় মেলে ট্রেনে ফাস্টক্লাস কম্পার্টমেন্টে শ্যামার শাড়ি-বণ্ঢাউজ বদলানোর দৃশ্যায়ণে– 'আমি যতক্ষণ না 'ইয়েস' বলছি, এদিকে মুখ ফেরাবে না' –শ্যামার এরূপ পরীক্ষণে। যদিও পরিপক্ব বয়সে এ ব্যাপারটিকে সে দেখছে বিশেণ্ঢষণী দৃষ্টিতে। শ্যামার সাহচার্য তার ভালো লাগে, শ্যামার উপরোধ-অনুরোধ সে উপেক্ষা করতে পারে না; কিন্তু শ্যামার সঙ্গে বন্ধুত্বের নির্দিষ্ট সীমানা সে অতিক্রম করে না। আবার, প্রিয়বন্ধু শ্যামার আচরণ সম্বন্ধে অপ্রিয় সত্যকথনেও সে পিছুটান দেয় না : 'শ্যামা, কিছু মনে করে না। তোমার মধ্যে হয়তো কিছু আছে, পুরুষরা মনে করে, তুমি আপত্তি করবে না।'[১৩] তাকে মাঝখানে রেখে হায়দারের সঙ্গে শ্যামার নিয়মিত মেলামেশাকে সে মেনে নিতে পারে না; অন্যদিকে

শ্যামাকে হায়দারের সঙ্গে ছেড়ে দিতেও তার মন সায় দেয় না। শ্যামার জীবনে তার জন্য একটা জায়গা আছে, যার প্রকৃতিটা 'সঠিক জানা না থাকলেও, সেই জায়গাটা আর কেউ দখল করতে পারবে না এবং সেই জায়গাটা শূন্য রেখে শ্যামাও স্থির থাকতে পারবে না' –এ রকম দৃঢ়বিশ্বাস থাকলেও শ্যামার প্রতি সে জোর খাটাতে পারে না। অনুরূপ শ্যামার বিরহে চলিণ্ঢশ বছর বয়সে পৌঁছেও সে বিবাহ করে না; কিন্তু সে-কথা সে ভুলেও প্রশ্রয় দেয় না। ফলত তার বিয়ে না করার রহস্য নিজের কাছেই থেকে যায় অজানা। অতঃপর শ্যামার সাড়া কিংবা স্বীকৃতিতে উন্মোচিত হয় মিন্টুর অন্তর্বেদনা :

> শ্যামা আমি এতোদিন জানতাম, অন্যমনস্কভাবে আমার জীবন কেটে গেছে, বিয়ের কথা সেভাবে মনেই আসে নি, আত্মীয়স্বজনও সেভাবে উদ্যোগী হয় নি, তাই বিয়েটা আমার হয়ে ওঠে নি। কিন্তু কিছুদিন আগে তুমি আমাকে এই প্রশ্ন করেছিলে। তখন থেকে বিষয়টি নিয়ে আমি অনেক চিন্তা করেছি। এখন জবাবটা জানি।... বিয়ে হয়তো করতে পারতাম। লাল শাড়িও থাকতো। ঘোমটাও থাকতো। কিন্তু... কিন্তু সেই ঘোমটার নিচে যে মুখটি থাকতো সেটি তোমার নয়। এতোদিনে আমিও বুঝেছি ঠিক সেই কারণেই আমি বিয়ে করি নি।[১৪]

আবার, পরিণত বয়সে ওয়েস্ট পাকিস্তানের শাসকদের একটার পর একটা মস্ত ভুলকে তাদের জীবনাদর্শের ফল বিবেচনায় 'যে অন্যায় করে আর অন্যায় বলে তার প্রতিবাদ না করলে অন্যায়কারী প্রশ্রয় লাভ করে; ভুল আর মিথ্যা সত্যের আসন পায়। আর যারা সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ তারা বিপদে পড়ে' –এমন অভিমত ব্যক্ত করলেও সে সমকালীন উত্তুঙ্গমুখর রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে চায় না। স্বপ্রতিভ মিন্টু চরিত্রটির এই স্ববিরোধ মূলত মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতাকেই নির্দেশ করে। বলা যায়, একদিকে 'মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের অবদমিত ভাব কিছুতেই মিন্টুর মনের সহজ প্রকাশ ঘটাতে সাহায্য করে না। ফলে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে পাশাপাশি কাছাকাছি থেকেও তারা প্রকৃত অর্থে পরস্পরের অচেনাই রয়ে যায়'[১৫]; অন্যদিকে মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক টানাপোড়েন অভীপ্সা থাকা সত্ত্বেও তার সীমানাকে অতিক্রম করতে দেয় না। ফলে প্রায়শই তার মনোবাসনার সঙ্গে সঙ্গতি হারায় কর্মপ্রেরণা।

শ্যামায় স্থানিক প্রেক্ষাপট হিসেবে ঢাকা প্রাধান্য পেলেও বাদ পড়ে নি করাচি, লাহোর ও কলকাতা শহর। অর্থাৎ ভৌগোলিক, আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে বাঙালি জাতির ক্রমবিকাশ, আভ্যন্তরীণ কোন্দলজনিত আত্মবিনাশ ও বাঙালিচৈতন্যের পুনর্প্রকাশকে ঔপন্যাসিক সাংকেতায়িত করেন সচেতনভাবে, শৈল্পিকরূপে। আপাত দৃষ্টিতে 'হিন্দু ঘেঁষা' হলেও হিন্দু-মুসলমানের ঊর্ধ্বে ওঠা শ্যামা মূলত সমন্বয়ধর্মী চিরন্তনী বাঙালি জাতিসত্তাকেই নির্দেশ করে। শ্যামার আধুনিক শিক্ষাগ্রহণ, ধর্মীয় সংস্কারহীন চালচলন, কংগ্রেস পলিটিক্সের সঙ্গে তার ব্যারিস্টার বাবার কিংবা সাউথ আফ্রিকায় গান্ধীজীর সঙ্গে তার ব্যারিস্টার দাদার কর্মমিলন প্রভৃতি প্রসঙ্গ বাঙালি জাতির ক্রমবিকাশেরই উদাহরণ। কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিভেদকে উস্কে দিয়ে সাতচলিণ্ঢশে দেশ বিভাগ সেই সমন্বিত অগ্রযাত্রাকে করে ব্যহত, দ্বিখণ্ডিত; মিন্টুর স্মৃতিচারণে :

তারপর একটার পর একটা অনেক কিছু ঘটে গেল। কলকাতার সেই বিখ্যাত দাঙ্গা। দেশ বিভাগ। চোদ্দই আগস্টের মধ্যরাতের আগে পর্যন্ত কলকাতার বিভিন্ন মহলা হিন্দু মহলা আর মুসলমান মহলায় বিভক্ত। হিন্দু মুসলমান পাড়ায় যায় না, মুসলমান হিন্দু পাড়ায় আসে না। ভুলক্রমে পা এদিক থেকে ওদিক হলে সে আর ফিরে আসে না। রাত্রির অন্ধকার বিদীর্ণ করে চিৎকার ওঠে বীভৎস সমবেত কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম'। পরক্ষণেই শোনা যায়, 'নারায়ে তকবির, আলা হো আকবর'। মুসলমানরা ভাবছে আজ রাত্রে হিন্দুরা তাদের পাড়া আক্রমণ করবে; হিন্দুরা ভাবছে, মুসলমানরা ঐ এলো বুঝি।

তারপর এলো সেই চোদ্দই আগস্টের মধ্যরাত। রেডিওতে কান পেতে সকলেই শুনলো কায়দে আযম, পন্ডিত নেহরুর বক্তৃতা। স্বাধীনতা শব্দটির মধ্যেই কোনো যাদু ছিল। সকলেই তাদের ভয়-ডর ভুলে গেল কেউ কাউকে নিমন্ত্রণ করলো না। বন্যার পানির মতো হড়হড় করে হিন্দুরা মুসলমান পাড়ায় আর মুসলমানরা হিন্দু পাড়ায় ঢুকে পড়লো। উচ্ছ্বসিত অফুরন্ত কোলাকুলি, মিষ্টান্ন বিতরণ। মধ্যরাত হয়ে গেল মধ্যদিন।

পরদিন পনেরোই আগস্ট। সমস্ত কলকাতা জুড়ে হিন্দু-মুসলমান মিলনের যে দৃশ্য দেখা গেল, যারা দেখেছে তাদের কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তার রিপোর্ট বার হলো 'আজাদ' পত্রিকায়, 'অমৃতবাজার' পত্রিকায় এবং অন্যান্য কাগজে। মুখস্থ করে রাখবার মতো সেসব রিপোর্ট।

পনেরোই আগস্টের সকাল থেকেই ঘরে আর কেউ থাকলো না। পথে পথে ঢল পড়লো নারীপুরুষ ছেলে বুড়োর। ওপরে উড়ছে মুসলিম লীগ আর কংগ্রেসের পতাকা। গিঁট দিয়ে বাঁধা। পথে এক পা নড়বার উপায় নেই। তবু দেখছি, টুপি পরা এক মুসলমান বৃদ্ধকে একটি সাইকেলে বসিয়ে আট দশজন হিন্দু ছেলে সেই সাইকেল টেনে নিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য এই মিলোনোৎসব বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। আবার এলো রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা।[১৬]

অতঃপর স্বাধীন পাকিস্তানে বাঙালির জীবনে নেমে আসে যে অশনি-সংকেত, দেখা দেয় যে অস্তিত্বের সংকট এবং তা থেকে উদ্ভূত যে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম– তা শ্যামার শ্বশুরালয়ের বৈঠকখানায় উপস্থাপিত হয়েছে ব্যঙ্গ-বিতর্কে :

রাজনীতির প্রসঙ্গ উঠলো। সময়টা উনিশশ' ছেষট্টি সালের মে মাসের শেষ সপ্তাহ। আইয়ুব খান, ছয় দফা, মওলানা ভাসানী। সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ থেকে অতীতেও ফিরে গেলেন। ইস্কান্দর মির্জার নাইনটি টুয়ের কথা উঠলো।

শ্যামা চুপ করে ছিল। এতক্ষণে বললো, 'নাইনটি টুয়ে না করে উপায় ছিল কি ? আদমজি জুট মিলে তোমরা যে কাণ্ডটা ঘটালে ! আর কর্ণফুলী পেপার মিলের ঘটনাও কি ভুলে গেলে ?'

সেই যে ছেলেটি দরজা খুলে দিয়েছিল সে বললো, 'কাণ্ডটা আমরা বাধালাম ? না তারা নাইনটি টুয়ে বসাবে বলে নিজেরাই ঘটনাটা তৈরি করলো ?' শ্যামা কোনো জবাব দিলো না। একবার শুধু ভ্রু উত্তোলন করে তার বিরক্তি প্রকাশ করলো। নিজের কাপে আর এক পেয়ালা চা ঢালতে ঢালতে শ্যামা আবার বললো, 'সমস্ত অশান্তি সৃষ্টি করলে তোমরাই। রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই এই দিয়েই তো শুরু হলো।'

সেই ছেলেটি বললো, 'শুরু ? শুরুর কথা শুনবেন ? ইস্ট পাকিস্তানে একটার পর একটা বাই-ইলেকশন যখন হতে দেয়া হলো না, শুরু তখন থেকেই। তারপর একটার পর একটা অন্যায়ের পাহাড় !'

সে কথারও কোনো জবাব দিলো না শ্যামা। কিন্তু সে চুপ করেও থাকলো না। শ্যামা বললো, 'এখন আবার ধরেছো ছয় দফা। দেশটাকে যে কোথায় ঠেলে নিয়ে যাচ্ছো তোমরা।'[১৭]

ঔপন্যাসিক শুধুমাত্র ঐতিহাসিক জাতীয় সংগ্রাম বা আন্দোলনের প্রসঙ্গ এনেই ক্ষান্ত হন নি; তিনি টুকরো টুকরো কিছু ঘটনার সমন্বয়ে উন্মোচন করেন স্বাধীন পাকিস্তানে বিপন্ন বাঙালির প্রাত্যহিক ইতিহাস : 'মনে কি দ্বিধা রেখে গেলে চলে' শ্যামার মেয়ের কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীতটি শুনে লাহোরের এক ভদ্রলোক মুগ্ধ হয়ে যখন প্রশ্ন করে, 'শায়ের কউন হ্যায় ?' তখন শ্যামা 'কিছু বলবার আগেই মুরাদ ঝট করে বলে ফেললো, কাজী নজরুল ইসলাম।' কেননা 'রবীন্দ্রসঙ্গীত যে পাকিস্তানকে দু'টুকরো করে দিচ্ছে এ খবর যে পশ্চিম পাকিস্তানে রটে গেছে।' তাই 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের খুব ভক্ত' হয়েও মুরাদ রবীন্দ্রসঙ্গীতের এলপিগুলো ভয়ে বাজাতে পারে না; শুধুমাত্র বাঙালি হওয়ার কারণেই তাদের টেলিফোনে আড়ি পাতা হয়, ফলত তারা টেলিফোনে বাঙালি আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গেও উর্দু ভাষায় কথা বলতে বাধ্য হয়–'দুটি কারণে। আমরা বুঝিয়ে দিতে চাই, অত বাংলা-টাংলা আমরা চাই না। দ্বিতীয় কারণ, বাংলায় কি বলছি তা তো বুঝবে না ; যদি অতি সাধারণ কুশল আলাপ শুনেও মনে করে আমরা কোনো গোপন তথ্য ফাঁস করে দিচ্ছি ! শুধু তাই নয়। আমাদের কতবার মনে হয়েছে, আমাদের বাড়িতে বাঙালি মেহমান এলেই বাড়ির দেয়ালের কাছে ওয়াচাররা ছায়ার মতো ঘাপটি মেরে বসে আছে।...এই পরিবেশে আছি। তাই ডাবল-টক আর ডাবল-থিঙ্ক আমাদের অভ্যস্ত জীবন হয়ে গেছে'[১৮]; কিংবা তেজগাঁ এয়ারপোর্টে প্রচুর জিজ্ঞাসাবাদ ও কড়াকড়ির সম্মুখীন হওয়া শ্যামার মামী 'কনক-মহীয়সী মহিলা'র তীব্র ক্ষোভজনিত যৌক্তিক অভিব্যক্তি : 'ওয়েস্ট পাকিস্তান আর ইস্ট পাকিস্তান একই দেশ। করাচি থেকে ঢাকা এসেছি, চেকিং হবে কেন? কাস্টমসের লোকজনদের ভাবসাব দেখে মনে হলো আমি যেন এক স্মাগলার। ঢাকা থেকে করাচি যাই তখন চেকিং হয়?'[১৯] পাকিস্তানে একজন দেশপ্রেমিকের স্বরূপ সম্পর্কে শ্যামার জীবনাভিজ্ঞতা ও আন্তর্যাতনা :

ইন্ডিয়ার চা খুব ভালো হয়তো, কিন্তু ভালো বলা যাবে না, সেটা পাকিস্তানি হিসেবে দেশপ্রেমের অভাব। সেটাকেই মন্দ বলো, মস্ত বড় পাকিস্তানি দেশপ্রেমিক হয়ে যাবে। মিথ্যাই কি তাহলে দেশপ্রেম !... অন্যের ভালোকে ভালো বলেও এবং কোনোরকম মিথ্যার আশ্রয় না নিয়েও যে নিজের দেশকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসা যায়, এই বুদ্ধি আমাদের কবে হবে ?[২০]

এজন্যই যে স্বাধীন পাকিস্তানে শ্যামা ফিরে যায় 'শামীম' নামে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ফলত স্বাধীন পাকিস্তানে ঘটে বাঙালির স্বপ্নভঙ্গ। অস্তিত্ব-বিপন্ন এদেশীয় বাঙালি এবার অন্যকোনো জাতির সঙ্গে নয়, একান্ত নিজের করে একটি দেশ চায়। শ্যামার দেবর মামুনের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয় বাঙালির সেই স্বপ্নগাঁথা ব্যাঘ্রগর্জন :

একটা কথা ভাবি পরিস্কারভাবে জেনে রাখুন। আমাদের ধনসম্পদ দিয়েই ওয়েস্ট পাকিস্তান ফলন্ত-ফুলন্ত হচ্ছে। ইরিগেশন প্রজেক্ট, ঘরবাড়ি,ইন্ডাস্ট্রি, ফরেন এক্সচেঞ্জের প্রায় সবটাই, যেটা উপার্জন করছি আমরা, তার সমস্তটাই ঢেলে নিজেদের বুনিয়াদ শক্ত করে নিচ্ছে। এটা আর আমরা হতে দেবো না।'[২১]

বস্তুত বাঙালির এই যে অস্তিত্বচেতন, সবুজ-শ্যামল বাংলাদেশকে ঘিরে বাঙালির এই যে নব জাগরণ ও আনন্দ আয়োজন, এর পশ্চাতে রয়েছে যে হাজার বছরের দীর্ঘ ক্রন্দন, অহর্নিশ স্বপ্নবুনন এবং মাটির স্বভাবগত সমর্থন– এই অখণ্ড চৈতন্যের শৈল্পিক রূপায়ণ-ই ঔপন্যাসিকের অন্বিষ্ট বা আরাধ্য।

কাহিনী বা ঘটনা-পরম্পরার বৈপরীত্যে শ্যামা ও মিন্টু চরিত্র দু'টির স্বরূপ বিনির্মাণের সমান্তরালে ষাটের দশকের বাংলাদেশের মানুষের জাতীয় চৈতন্য ও সমকালীন রাষ্ট্রিক উৎকণ্ঠাকে উপজীব্য করে ঔপন্যাসিকের এক অভিনব শিল্পপ্রয়াস গুরুত্ব পায় *শ্যামা* উপন্যাসে। ফলে *শ্যামা* নর-নারীর অচরিতার্থ প্রেমের আলেখ্য হয়েও দেশপ্রেম ও দেশাত্মবোধের এক অনন্য প্রতিভাস। জীবনবোধ ও জীবনের বিস্তৃতি বিচারে, ব্যক্তির অনালোকিত মনোবাস্তবতা উন্মোচনে, ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতনায়, কিংবা আঙ্গিক গঠনে ঔপন্যাসিকের নিরীক্ষাপ্রবণতায় স্বল্পপ্রাণা *শ্যামা* নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় এবং বাংলাদেশের উপন্যাসসাহিত্যে বিশেষ মর্যাদার দাবিদার।

তথ্য নির্দেশিকা

১. উপন্যাস-সমগ্র : রশীদ করীম, অক্টোবর ২০০২, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, পৃ.৭৭১
২. পূর্বোক্ত, পৃ.৭৮০
৩. পূর্বোক্ত, পৃ.৭৭২
৪. পূর্বোক্ত, পৃ.৭৭৬
৫. পূর্বোক্ত, পৃ.৭৭৮-৭৭৯
৬. পূর্বোক্ত, পৃ.৭৭৯
৭. পূর্বোক্ত, পৃ.৭৯০
৮. পূর্বোক্ত, পৃ.৭৭১-৭৭২
৯. পূর্বোক্ত, পৃ.৮০১
১০. সুস্মিতা ইসলাম, 'একটি প্রেমের উপন্যাস : *সোনার পাথর বাটি*', দৈনিক বাংলা বাজার পত্রিকা, ৭অক্টোবর১৯৯৪, ঢাকা
১১. পূর্বোক্ত, পৃ.৭৮৭-৭৮৮
১২. গুণময় মান্না, 'এক মুঠো : রশীদ করীমের তিনটি লেখা', জিজ্ঞাসা, সম্পাদক : শিবনারায়ণ রায়, পঞ্চম বর্ষ : চতুর্থ সংখ্যা, মাঘ-ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৯১, পশ্চিমবঙ্গ, পৃ.৪৮৬
১৩. উপন্যাস-সমগ্র : রশীদ করীম, পৃ.৭৭৬
১৪. পূর্বোক্ত, পৃ.৮০১-৮০২
১৫. সুস্মিতা ইসলাম, পূর্বোক্ত
১৬. উপন্যাস-সমগ্র : রশীদ করীম, পৃ.৭৭৯-৭৮০
১৭. পূর্বোক্ত, পৃ.৭৮২
১৮. পূর্বোক্ত, পৃ.৭৮৬
১৯. পূর্বোক্ত, পৃ.৭৯৫
২০. পূর্বোক্ত, পৃ.৭৯১
২১. পূর্বোক্ত, পৃ.৭৯৫-৭৯৬